ইসলাম ও গণতন্ত্র

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলাম ও গণতন্ত্র

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়

আল আযামী পাবলিকেশন্স

১১৯/২ কাজী অফিস লেন, বড় মগবাজার,

ঢাকা-১২১৭ ফোন-৯৩৫৩১১৩

www.faith-and-theology.com

ইসলাম ও গণতন্ত্র
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়
আল আযমী পাবলিকেশন্স
১১৯/২ কাজী অফিসলেন
বড় মগবাজার ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৯৩৫৩১১৩

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

শব্দ সংযোজন ও তত্বাবধানে
তাসনিম কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
ফোন-০১৭১৫৮১২৫৫

প্রচ্ছদ
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক্স. ঢাকা

স্বত্ব ঃ লেখক

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০০৩
অষ্টম প্রকাশ
মার্চ ২০০৬

মূল্যঃ পাঁচ টাকা মাত্র

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়

প্রথমে ইসলাম সম্বন্ধে এটুকু আলোচনা করা প্রয়োজন যে ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে চর্চার দরকার কি। ইসলাম যদি অন্যান্য ধর্মের মতো কতক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম হতো তাহলে এ আলোচনার কোন প্রয়োজন হতো না। কারণ ধর্মের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই বলেই অন্যান্য ধর্মের নেতারা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্ম নয়।

আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে দ্বীন বলেছেন– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ। "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দ্বীন বলতে ইসলামই বুঝায়"। (সূরা আলে ইমরান-১৯)।

رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا "আমি সন্তুষ্ট হয়ে ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে দান করলাম"। (সূরা আল মায়েদা-৩)

এ দু'টো আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা 'দ্বীন ইসলাম' বলে থাকি। সাধারণ লোকেরা দ্বীন অর্থ ধর্ম মনে করে বলেই দ্বীন ইসলামের অনুবাদ করে 'ইসলাম ধর্ম'।

দ্বীন শব্দের অর্থ আনুগত্য। আর ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। তাই দ্বীন ইসলাম অর্থ হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে তাঁর আনুগত্যের বিধান। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম এমন একটি জীবনবিধান যা আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাঁর পূর্ণ আনুগত্য দাবী করে।

ইসলামের বাস্তব রূপ হচ্ছে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন। তিনি ৪০ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর পর্যন্ত যা করেছেন এর সবটুকুই আসল ইসলাম। তিনি মসজিদে ইমামতি করেছেন, মদীনায় রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিত্বও করেছেন। এ সবই তিনি আল্লাহর রসূল হিসাবে করেছেন। তাই রসূল (সাঃ) অবশ্যই রাজনীতির ময়দানেও ইসলামের আদর্শ।

কুরআন ও রসূল (সাঃ)-এ বিশ্বাসী সবাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, রাজনীতি ইসলামেরই একটি দিক। মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক যেমন আছে, তেমনি রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। এ কারণেই এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ওঠে যে ইসলামে কতটুকু গণতন্ত্র আছে।

গণতন্ত্র বলতে কী বুঝায়?

আমেরিকার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিংকন গণতন্ত্রের চমৎকার এক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাহলো ঃ Government of the people, for the people, by the people (জনগণের সরকার, জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা)। এর প্রথম কথাটির মর্ম হলো ঃ যদিও সরকার কিছু লোকেই পরিচালনা করে বটে,

কিন্তু সরকার এমন হতে হবে যেন জনগণ তাদের সরকার মনে করে। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ হলো সরকারকে জনগণের খেদমতের উদ্দেশ্যেই কাজ করতে হবে। তৃতীয় কথাটির মানে হলো, সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত লোকদের দ্বারাই পরিচালিত হতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের বিশেষ একটি পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র বিশ্বজনীন একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। জনগণের অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতিকেই গণতন্ত্র বলা হয়। নীতিগতভাবে এ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করে। সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকুক এটা প্রত্যেক সরকারেরই ঐকান্তিক কামনা। তাই সামরিক একনায়করাও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বলে স্বীকৃত হবার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জনপ্রিয়তা এবং সর্বজনীনতাই এর আসল কারণ।

গণতন্ত্রের মূলনীতি

গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো পাঁচটি ঃ

১. নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন যারা পায় তাদেরই সরকারী ক্ষমতা হাতে নেবার অধিকার রয়েছে।

২. এ নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে এর বাস্তব ব্যবস্থা হওয়া অপরিহার্য। নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে পারে। বিরোধী দলও এমন সরকারের বৈধতা ও নৈতিক অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

৩. সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করার জন্য জনগণের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইন-শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ।

৪. জনগণের মতামত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৫. সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ হতে হবে। শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ বিবেচিত হবে।

ইসলাম ও গণতন্ত্র

ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের উপরোক্ত পাঁচটি মূলনীতির কোন বিরোধ নেই। জনগণের উপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন

অনুমতি ইসলামে নেই। রসূল (সাঃ)-এর পর যে চারজন রাষ্ট্রনায়ক খোলাফায়ে রাশিদীন হিসাবে বিখ্যাত তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেননি। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহেই তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের নির্বাচনের পদ্ধতি একই রকম ছিলো না কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিতই ছিলেন। তাঁরা কেউ এ পদের প্রার্থী ছিলেন না। আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী পদের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পদের অযোগ্য মনে করতে হবে।

এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ)-এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাহাবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য নন। কারণ তিনি চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন। অথচ হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রঃ) সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য বলে বিবেচিত। এর কারণ এটাই যে, রাজবংশের রীতি অনুযায়ী তাঁর পূর্ববর্তী শাসক তাকে মনোনীত করার পর ঐ পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়া ইসলাম সম্মত নয় বলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জনগণ তারই উপর আস্থা স্থাপন করায় তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ইসলামে শাসন ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব এলে পালানোরও অনুমতি নেই। এ নীতি গণতন্ত্রের আধুনিক প্রচলিত পদ্ধতির চেয়েও কত উন্নত!

ইসলামে সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। নামাযে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির উপর লুকমা (ভুল ধরিয়ে দেয়া) দেয়া ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হলো রসূলের প্রতিনিধি। নামাযের ইমাম যেমন রসূলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাদিদেরকে পালন করতে হয়, তেমনি রসূল (সাঃ) যে নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। এসব দিক বিবেচনা করলে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ও ইসলামের সাথে শুধু মিলই নয়, ইসলামের নীতি গণতন্ত্রের চাইতেও অনেক উন্নত ও ত্রুটি মুক্ত।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারণা

প্রচলিত গণতন্ত্র পাশ্চাত্য থেকেই আমদানি হয়েছে। ঐ গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার সর্বোচ্চ শক্তি। আইনের সর্বজনীন সংজ্ঞা হলো "Law is the will of the sovereign" (সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন)। আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় জনগণই সার্বভৌম সত্তা। তাই জনগণ ও জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট যে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। অবশ্য পার্লামেন্ট জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র মেনে

চলতে বাধ্য। তবে পার্লামেন্ট দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাসনতন্ত্রও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। নির্বাচিত পার্লামেন্টই বাস্তবে জনগণের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব করতে পারে না।

পাশ্চাত্য বলতে আমেরিকা ও ইউরোপকেই বুঝায়। সেখানে ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও তারা জড়বাদে (বস্তুবাদ) বিশ্বাসী। তাদের সভ্যতার ভিত্তিই হলো জড়বাদ। এ মতবাদের সার কথা হলো ঃ বস্তুর উর্ধে অতীন্দ্রিয় কোন সত্তায় বিশ্বাস করা জরুরী নয়। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। Divine Guidance (আল্লাহর হেদায়াত) এর কোন প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় ব্যাপারে যার যার ধর্ম বিশ্বাসে সবাই স্বাধীন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক জীবনে ধর্মকে টেনে আনা অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়।

যদিও মানুষ নৈতিক জীব এবং ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সর্বজনীন ধারণা ও চেতনা সবাই স্বীকার করে, তবুও অধিকাংশ মানুষ একমত হয়ে এ সবের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী বলে তারা মনে করে।

এ নীতির ভিত্তিতেই পাশ্চাত্যের সব দেশের আইনেই পরস্পর সম্মতি থাকলে বিয়ে ছাড়াও নারী ও পুরুষের যৌন মিলন দোষণীয় নয়। এমন কি কয়েকটি দেশের আইনে সমকামিতাও বৈধ। অথচ পশুদের মধ্যেও সমকামিতা নেই।

এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে Divine Guidance-কে অস্বীকার করে শুধু জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হতে পারে। কোন পশুর মধ্যেই সমকামিতার মতো অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায় না। অথচ শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে তা আইনত বৈধ বলেও স্বীকৃতি পায়!

বিস্ময়ের বিষয় যে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে না; কিন্তু সামষ্টিক জীবনে স্রষ্টার নির্দেশ মানা প্রয়োজন মনে করে না। তারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। আবার তারা ধর্মেও বিশ্বাসী। কিন্তু ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করে।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌম শক্তিরই ইচ্ছা ও মতামত। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইনসভাই সকল ক্ষেত্রে আইন-দাতা। আইনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা তাদেরই হাতে। ইসলামে আল্লাহর দেওয়া আইন ও বিধানের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেবার বৈধ অধিকার জনগণের বা পার্লামেন্টের নেই। ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের এ মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে আইনের নিরপেক্ষ শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনের অধীনেই চালু হওয়া সম্ভব। মানব রচিত আইনের এমন নৈতিক মর্যাদা সৃষ্টি হতে পারে না যা পালন করার জন্য মানুষ অন্তর থেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মানুষের তৈরি আইনকে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ থেকে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টাকে কেউ বড় দোষ মনে করে না। কিন্তু আল্লাহর আইনের বেলায় পুলিশ থেকে বেঁচে গেলেও আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা নেই বলে এর নৈতিক প্রভাব গভীর। এদিক বিবেচনা করলে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সার্থক রূপ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়।

গণতন্ত্র কি জীবনবিধান?

পাশ্চাত্যে এবং তাদের অনুকরণে প্রাচ্যেও গণতন্ত্রকে আদর্শের মর্যাদা দেবার প্রবণতা আছে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক যে মত পোষণ করে তা নৈতিকতা বিরোধী হলেও তা বৈধ হিসাবে গণ্য। এ নীতি মনুষ্যত্ব ও মানবতা বিরোধী। মানুষ নৈতিক জীব। মানুষের মধ্যে বিশ্বজনীন মূল্যবোধ রয়েছে। "সত্য কথা বলা ভাল। মিথ্যা বলা অপরাধ।" এটা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন। মানুষ স্বার্থের জন্য মিথ্যা কথা বললেও মিথ্যা বলা ভাল বলে স্বীকার করে না। অধিকাংশ লোক কোন বিষয়ে মিথ্যা বললেই তা বৈধ বলে গণ্য হাতে পারে না।

যুক্তি, বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মদ খাওয়াকে মন্দ বলে স্বীকার করে। আমেরিকার আইন সভায় ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে শাসনতন্ত্রের ১৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে মদকে অবৈধ ঘোষণা করে আইন পাশ করা হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে শাসনতন্ত্রের ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তী আইন বাতিল করে মদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।

মদ যদি ভাল হয়ে থাকে তাহলে সব সময়ই ভাল, আর মন্দ হয়ে থাকলে সব সময়ই মন্দ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কোন বিষয়কে ভাল বা মন্দ বলে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অযৌক্তিক।

ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যার সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে হতে পারে না। এ সব শাশ্বত মূল্যবোধের ব্যাপার। যাদের কোন স্থায়ী মূল্যবোধ নেই তারা গণতন্ত্রকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। যারা শাশ্বত মূল্যবোধে বিশ্বাসী তাদের নিকট গণতন্ত্র সরকার গঠন ও পরিবর্তন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি পদ্ধতি মাত্র। গণতন্ত্র কোন জীবনবিধান নয়।

'ইসলামে গণতন্ত্র আছে কিনা' এ প্রশ্নের ভিত্তি কী?

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর দুনিয়ায় মুসলিম শাসন কমপক্ষে এক হাজার বছর চালু ছিল। এ দীর্ঘ শাসনামলে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার উত্থান-পতন

হয়নি। কিন্তু ইসলামের আদালত ও ফৌজদারী আইন চালু থাকায় এবং এর ফলে ন্যায় বিচার প্রচলিত থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম জনগণও সে শাসনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিদ্রোহ করেনি। জনগণের বিদ্রোহের কারণে মুসলিম শাসনামলে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে ইতিহাস এ কথা বলে না।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে উমাইয়া বংশের, পরবর্তীতে আব্বাসীয় বংশের এবং আরও পরে বংশীয় রাজতন্ত্রই চালু ছিল। সরকারের সামরিক শক্তিই ক্ষমতার উৎস বিবেচিত হতো। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠিত সরকারকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করতো। জনগণ কোন সিদ্ধান্তকারী শক্তি ছিল না। অথচ ইসলামী আইন চালু থাকায় ঐ শাসনকালকে ইসলামী মনে করা স্বাভাবিক ছিল।

এ কারণেই এ প্রশ্ন তোলা দোষণীয় নয় যে ইসলামে গণতন্ত্র আছে কিনা। মধ্যপ্রাচ্যে বংশীয় রাজতন্ত্র বা সামরিক স্বৈরশাসন এখনও চালু আছে। এর কোন কোন দেশে ইসলামের বহু আইন জারী থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও পরিবর্তন হয় না। তাই এ প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয়।

ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসন

প্রকৃত কথা এটাই যে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর একমাত্র হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের শাসনকাল ছাড়া অবশিষ্ট শাসনকালকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন বলা যায় না। ঐ সব শাসনকে মুসলিম শাসনই বলা উচিত। কারণ মুসলমানরা যা করে তাই ইসলাম নয়। ইসলাম যা করতে বলে তা করা হলেই ইসলামী কাজ বলে গণ্য হয়।

রসূল (সাঃ) কে স্বয়ং আল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছেন। তাই তাঁর ব্যাপারে নির্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁর পরে কে সরকারী ক্ষমতার অধিকারী হবেন সে বিষয়ে তিনি কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি। মদীনার আনসার ও মুহাজিরগণ হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তার ইন্তিকালের পূর্বে মদীনাবাসীকে সমবেত করে হযরত ওমরকে এ দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব দিলে সবাই তা সমর্থন করেন। হযরত ওমর (রাঃ) তার ইন্তিকালের পূর্বে ৬ জন বিশিষ্ট সাহাবীর এক প্যানেল গঠন করেন। প্যানেলের অন্যতম সদস্য হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বাকী ৫ জনের ব্যাপারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ঘরে ঘরে যেয়ে জনমত সংগ্রহ করেন। অধিকাংশ মদীনাবাসী হযরত ওসমানের (রাঃ) পক্ষে রায় দেন। হযরত ওসমান (রাঃ) নিহত হবার পর মদীনাবাসীরা হযরত আলী (রাঃ)-কে এ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দাবী জানান। রসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর যেভাবে মদীনাবাসীরা হযরত আবু বকরের (রাঃ) হাতে বাইয়াত হন তেমনিভাবে তারা হযরত আলীর (রাঃ) নিকট বাইয়াত হন। হযরত আলী (রাঃ) নিজের উদ্যোগে খলীফা হননি।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে প্রথম ৪ খলীফা নিজেরা চেষ্টা করে ক্ষমতা দখল করেননি। তারা একই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হননি, কিন্তু অবশ্যই তারা নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে ইসলাম নির্বাচনের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করেনি। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে নিজেদের উপযোগী নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। পদ্ধতি যে রকমই হোক একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন হতে হবে-এটাই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ। সাহাবাগণের যুগেই এ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাবেয়ীগণের যুগে খলীফা সুলাইমান মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে খামে বন্ধ করে রেখে নির্দেশ দেন যে তার মৃত্যুর পর সকল গণ্যমান্য নাগরিকদেরকে সমবেত করে ঐ খাম খুলতে হবে। যাকে খলীফা নিয়োগ করা হলো সবাই তাঁর নিকট বাইয়াত হবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী সমাবেশে খামটি খুলে যখন পড়া হলো তখন জানা গেল যে খলীফা সুলাইমান তাঁর ছেলেকে বাদ দিয়ে চাচাতো ওমর বিন আবদুল আযীযকে নিয়োগ করেছেন।

নেতৃস্থানীয় লোকেরা নবনিযুক্ত খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতে (বাইয়াত হতে) এগিয়ে আসার আগেই ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "যে পদ্ধতিতে আমাকে খলীফা নিয়োগ করা হয়েছে তাকে আমি ইসলামী পদ্ধতি মনে করি না। তাই আমি আপনাদের বাইয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। কাকে খলীফার দায়িত্ব দেয়া হবে এ বিষয়ে ফায়সালা করার ইখতিয়ার আপনাদের। আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের খলীফা নির্বাচিত করুন।" সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন, "আমরা আপনাকেই নির্বাচিত করলাম। আপনি পদ চান না বলে আপনাকেই আমরা এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত গণ্য করি।"

এ ঘটনাটি বড়ই নাটকীয় মনে হয়। কিন্তু এ থেকে একথাই প্রমাণিত হলো যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার সূত্রে খলীফা হওয়ার রেওয়াজ চালু হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ) খলীফা নিয়োগের ঐ পদ্ধতি ইসলাম সম্মত নয় বলে ঘোষণার সাথে সাথে রাষ্ট্রের সকল নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য নাগরিক এর সমর্থন করে প্রমাণ করলেন যে তারাও সবাই ইসলামের বিধান সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইতিহাস সাক্ষী যে হযরত ওমর বিন আবুদল আযীয খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণেই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কারণেই তিনি পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ ও দ্বিতীয় ওমর হিসাবে উম্মতের নিকট মর্যাদা পেয়েছেন।

গণতন্ত্র কি ইসলাম বিরোধী ?

ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে কায়েম করার উদ্দেশ্যে যারা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে সক্রিয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ বলে

প্রচার করেন। এ কথা অবশ্যই সত্য যে জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে গণতন্ত্র বিশ্বে চালু আছে তা নিঃসন্দেহে কুফরী।

এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে দেশে মুসলিম জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সে দেশে অনিসলামী নেতৃত্বের বদলে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করার পন্থা কী? যেসব দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের নিয়ম চালু নেই সেসব দেশের কথা আলাদা। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশে নির্বাচন পদ্ধতি চালু রয়েছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিবর্তন হচ্ছে সেসব দেশে নির্বাচন করা কি ইসলাম বিরোধী? ঐ সব দেশেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের চেষ্টা করছে। এ নির্বাচনকে কোন যুক্তিতে কুফরী বলবেন?

বহু কারণে নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী সরকার কায়েম করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই নির্বাচন প্রথাটিকেই অনিসলামী বলা কি সংগত? নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিবর্তন করার পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র।

যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনকে ইসলাম বিরোধী মনে করেন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা, "তাদের নিকট গণতন্ত্রের বিকল্প কী পন্থা রয়েছে?"

এ প্রশ্নের জওয়াবে তারা যা বলে থাকেন তাহলো "বিপ্লব"। তারা বিপ্লব করে ইসলাম কায়েম করতে চান। কিন্তু সে বিপ্লবের রূপ-রেখা কী সে বিষয়ে কোন ধারণা তাদের আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

গণতন্ত্র বনাম বিপ্লব

"গণতন্ত্র বনাম বিপ্লব" শিরোনাম থেকে এটাই প্রতিপাদ্য বলে মনে হবে যে, বিপ্লব গণতন্ত্রের বিপরীত পদ্ধতি। আসলে বিপ্লব শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। ব্যাপক পরিবর্তন বা মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। আল্লাহর রসূল (সাঃ) চরিত্রহীন সমাজে উন্নত নৈতিক চরিত্রের লোক তৈরি করে তাদের জীবনে সত্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। তিনি মদীনায় বিনা রক্তপাতে সরকারী ক্ষমতা গণ-সমর্থনের মাধ্যমে লাভ করে প্রচলিত গোটা সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। এ জাতীয় মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা যায়। অবশ্য 'দার্শনিক বিপ্লব'ই এ জাতীয় পরিবর্তনের সঠিক সংজ্ঞা। এটাকে সশস্ত্র বিপ্লব বলা সম্ভব নয়।

বিপ্লব শব্দের ব্যবহার ঃ সাধারণভাবে "বিপ্লব" বললে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সামরিক অভ্যুত্থান, শক্তিবলে সরকারকে উৎখাত ইত্যাদি বুঝায়। এভাবে ক্ষমতা দখলকারী সরকার গৌরবের সাথে "বিপ্লবী সরকার" নামে পরিচয় দেয়। ঐই কারণেই যখন কেউ বিপ্লবের আওয়াজ তোলে তখনই মানুষ শক্তির ব্যবহার হবে বলে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করে।

অবশ্য আজকাল "বিপ্লব" শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার অনেকেই করছেন। আন্দোলন করার অর্থেই তারা বিপ্লব শব্দ ব্যবহার করছেন। নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপক প্রচেষ্টাকে আন্দোলন বা অভিযান বলাই যুক্তিযুক্ত। এ কাজটি এত শ্রমসাধ্য ও সাধনা সাপেক্ষ যে, কয়েক বছরেও যদি কোন দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে সক্ষম হয় তাহলে জাতীয় জীবনে এটা অবশ্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু এ পরিবর্তন গায়ের জোরে হবে না। সাক্ষরতা আন্দোলন সফল হলেই তা সম্ভব। সেচ ব্যবস্থাকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে এবং বন্যার পানিকে ধারণ করার প্রয়োজনে খালখননের গণআন্দোলনকে "বিপ্লব" নাম দেয়া হচ্ছে। এক একটি শব্দের বিশেষ একটা ওজন আছে। যেখানে সেখানে কোন শব্দের প্রয়োগ সাহিত্যরস বা হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

"বিপ্লব" শব্দটি কোথায় ব্যবহার করা উচিত বা অনুচিত এ বিষয়ে মতভেদ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আওয়াজ জনগণ শুনতে পায় সেখানে বিপ্লবের সস্তা ব্যবহার চলতে থাকলে মানুষের মধ্যে অবাঞ্ছিত বিপ্লবের প্রতিরোধ স্পৃহা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কঠিন পরিস্থিতিতেও বিপ্লবের আওয়াজকে "খাল কাটা বিপ্লবের" মতই জনগণ নিরাপদ মনে করে অবহেলা করতে পারে। তাই "বিপ্লব" সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজনেই হালকাভাবে এর ব্যবহার অনুচিত।

যা হোক "বিপ্লব" শব্দের ব্যবহার আলোচ্য বিষয় নয়। ভাববার বিষয় হলো যে আমরা বিপ্লবী সরকার চাই, না গণতান্ত্রিক সরকার কামনা করি। দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন চাই, না গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাই। জনগণকেও এ বিষয়ে সজাগ হতে হবে যে, কাদেরকে সমর্থন করা উচিত। যাঁরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই সর্বদিক দিয়ে কল্যাণকর মনে করেন তাঁদের কর্মপদ্ধতি এক ধরনের হবে। আর যারা শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী তাদের কর্মনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক।

গণতান্ত্রিক মনোভাব ঃ যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের আচরণ গণতন্ত্র সম্মত হতে হবে। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলনকে অশালীন ভাষায় গালি দেয়া চলে না। গণতন্ত্রমনা লোকের ভাষাই জানিয়ে দেয় যে, তিনি অধৈর্য নন। সরকারী ক্ষমতায় থেকে কোন বিরোধী দলকে অন্য দেশের দালাল বলে গালি দেওয়া অর্থহীন। দালাল হয়ে থাকলে আইনের মাধ্যমে বিচার করুন। সরকারের হাতেই আইন রয়েছে। সে আইনের প্রয়োগ না করে অসহায়ের মত গালি দেওয়া দুর্বলতারই পরিচায়ক। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এদেশে যে হারে একে অপরকে বিদেশী দালাল বলছে, তাতে দুনিয়ার মানুষ আমাদের সবাইকে শুধু দালালই মনে করবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে রাজনীতিবিদদের পরম ধৈর্যশীল হতে হবে। দুঃখের বিষয়, এ ধৈর্যেরই অভাব সবচেয়ে বেশি। সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সমালোচনার ভাষা যে নিম্নমানের লক্ষণ প্রকাশ করে তা গোটা জাতির জন্য লজ্জাজনক। এ

বিষয়ে সরকারী দলের দায়িত্বই বেশি। তাঁরা ক্ষমতায় থেকে যদি আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা না করেন, তাহলে বিরোধীরা শিখবে কি করে? যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের অধৈর্য হবার কোন প্রয়োজনই নেই। বিরোধীরা ক্ষমতায় যাবার জন্য যদি অধৈর্য হয় তাহলে কিছুটা এলাউন্স তাদেরকে দিলে তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধন হতে পারে।

বিরোধী দলের অবশ্যই ক্ষমতা পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু কিভাবে তারা ক্ষমতায় যেতে চান? একটা নির্বাচন হয়ে গেল। তাঁরা নির্বাচনে অংশও নিলেন। আর একটি নির্বাচন পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাঁদেরকে কাজ করে যেতে হবে। বর্তমান শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। এসব কথা যেমন সত্য তেমনি অগণতান্ত্রিক পন্থায় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে না সে কথাও সত্য। তাই যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের নিজেদের কার্যাবলী প্রথমে গণতন্ত্র সম্মত হতে হবে।

যারা বিরোধী দলে আছে তারাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পেতে চাইলে তাদের কার্যক্রম এক ধরনের হবে। কিন্তু যদি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায় তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ কর্মধারাই তারা অনুসরণ করবে। তাদের কর্মনীতি ও কর্মপন্থা থেকেই তাদের প্রকৃত চেহারা সবার সামনে স্পষ্ট হতে বাধ্য।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে জনগণকে তাদের কার্যাবলী দ্বারা এতটুকু রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তথাকথিত বিপ্লব ও গণতন্ত্রের পার্থক্য বুঝতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে সবার জন্যই নিরাপদ এ বিষয়ে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে সজাগ করে তুলতে হবে।

বিপ্লবের অনিশ্চিত পথ ঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্যাগ করে যারা বিপ্লবের পথে গদিতে যেতে চান তাদের নিজেদের নিরাপত্তা কি নিশ্চিত? তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিপ্লব যেখানেই এসেছে সেখানে গণতন্ত্র কোথাও দানা বাঁধতে পারেনি। বিপ্লবের পর বিপ্লব লাইন ধরে এসেছে। এটা কি নিরাপদ পথ? শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতায় গেলে শক্তির উপর নির্ভর করেই শাসন চলে। এ ধরনের সরকার জনগণের সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে না বলে যখন জনসমর্থন হারায় তখন সুযোগ বুঝে পাল্টা বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করে। তাই এ পথ একেবারেই অনিশ্চিত।

বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে যারা বিপ্লব করে তাদের অবস্থা আরও করুণ। আফগানিস্তানে নূর মুহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন ও কারমাল এ বিপ্লব দ্বারা কী পেলেন? যারা কাবুল স্টাইলে স্বপ্ন দেখেন তারা এটাকে নিরাপদ পথ মনে করেন কোন যুক্তিতে? তথাকথিত বিপ্লবের পথে দেশকে একবার ঠেলে দিলে ফিরিয়ে আনার উপায় থাকে না। এ বিপ্লব জনগণের পারস্পরিক আস্থা খতম করে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে দেশ গৃহযুদ্ধের আগুনে ছারখার হতে থাকে।

তাই বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপরই সবার আস্থা স্থাপন করা উচিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশে চালু করার প্রধান দায়িত্ব ক্ষমতাসীনদের। তারা যদি নিজেদের গদি ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে তাদের রেশন করা মাপে গণতন্ত্র দেন তাহলে ময়দান বিপ্লবীদেরই পক্ষে যাবে। যদি আন্তরিকতার সাথে গণতন্ত্রকে বিকাশ লাভের সুযোগ দেন তাহলে গণতান্ত্রিক শক্তিই ময়দানে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে বিপ্লবীদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। ক্ষমতাসীনরা ১৯৪৭ সাল থেকে একই ধারায় গণতন্ত্রকে কোণঠাসা করে বিপ্লবী মনোবৃত্তিকে সুযোগ করে দিয়েছে। এর কুফল ক্ষমতাসীনরাই বেশি ভোগ করেছে। কারণ ক্ষমতায় চিরদিন থাকা যায় না। গদি একদিন ছাড়তে হয়-ই। এমন নিরাপদ পদ্ধতি চালু থাকা দরকার যাতে গদি থেকে নামার পরও আবার উঠার সিঁড়িটা বহাল থাকে। একবার কোন প্রকারে কেউ ক্ষমতা পেলে অন্য কেউ যাতে সেখানে যাবার পথ না পায় সে উদ্দেশ্যে সিঁড়িটাই নষ্ট করে দেয়। ফলে নিরাপদে তারা নামার পথও পায় না। গদিতে উঠা নামার পথটা পরিষ্কার রাখাই গণতন্ত্রের পরিচায়ক।

পাক-ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদেরকে সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয়। কিন্তু মানুষ ইতিহাস থেকে কমই শিক্ষা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক পথে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা থেকে বিদায় হলেন। অনেকে মনে করেছিল যে, তিনি চিরবিদায় নিলেন। কিন্তু ঐ গণতান্ত্রিক পথেই আবার ফিরে আসার সুযোগ পেলেন। গণতন্ত্রের ওপর আস্থা হারানো বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। শেখ মুজিব ও ভুট্টো জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেও গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারালেন। ফলে এমন পথে তাদেরকে যেতে হলো, যে পথে গিয়ে আর ফিরে আসবার উপায় থাকল না। ক্ষমতাসীনরা যদি এটা বুঝতে পারতো তাহলে ইতিহাসের অনেক করুণ ঘটনাই হয়তো ঘটতো না।

সরকারী ও বিরোধী সব দলকে অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার যে, দেশের জন্য, তাদের দলের জন্য, এমন কি নেতাদের জন্যও কোন্ পথটা মঙ্গলজনক ও নিরাপদ। নির্ভেজাল গণতন্ত্র দিলে সরকারী দলের গদিচ্যুত হবার আশংকা থাকলেও আবার জনসমর্থন নিয়ে গদি ফিরে পাওয়ার আশা থাকবে। বিরোধী দল এক নির্বাচনে ক্ষমতা না পেলেও আবার সে সুযোগ আসতে পারে। তাই গণতন্ত্রের এমন নিরাপদ পথই সবার কাম্য হওয়া উচিত।

গণতন্ত্র হলো যুক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও খেদমতের প্রতিযোগিতা। আর বিপ্লব হলো বন্দুকের লড়াই। মনুষ্যত্বের উন্নয়ন বন্দুকের হাতে অসম্ভব। এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ত্রুটি আছে। তবে প্রচলিত অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে তা কম মন্দ। গণতন্ত্রকে প্রকৃত কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসাবে দেখতে চাইলে ইসলামের কতক মৌলিক শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ সবচেয়ে বড় কাজ

হলো আমাদের যুব শক্তিকে তথাকথিত বিপ্লবের রোমান্টিক শ্লোগানের মোহ থেকে ফিরিয়ে রাখা। এ জন্যই ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান উঠছে। বিপ্লবই যদি চাও তাহলে এস ইসলামের ছায়াতলে। আল্লাহর রসূল মক্কা বিজয় করলেন বিনা রক্তপাতে। গোটা আরবে তিনি মনুষ্যত্বের মহাবিপ্লব আনলেন গায়ের জোরে নয়, চরিত্রের বলে। এরই নাম গণতন্ত্র।

'গণতন্ত্র' পরিভাষার প্রতি এলার্জি

সত্যিকার গণতন্ত্র খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই প্রথম চালু হয়। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য থেকেই গণতন্ত্র প্রাচ্যে এসেছে। তাদের গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব জোরে-সোরে প্রচারিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসীদের কেউ কেউ গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন। কিন্তু এটাই গণতন্ত্রের একমাত্র সংজ্ঞা নয়। "জনগণের সার্বভৌমত্ব" কথাটি অবশ্যই কুফরী বক্তব্য। আমরা গণতন্ত্রের এ সংজ্ঞাকে কিছুতেই গ্রহণ করি না।

কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের নিয়মকে কি অস্বীকার করা যায়? যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কি বিকল্প কোন পথ আছে? মসজিদ কমিটি থেকে শুরু করে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি পরিচালনার জন্য যাদের উপর দায়িত্ব থাকে তাদের অধিকাংশের মতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এটাকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলা হয়।

যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই মসজিদ-মাদ্রাসা পরিচালনা করে থাকেন। তাই 'গণতন্ত্র' পরিভাষার প্রতি এমন এলার্জি যুক্তিযুক্ত নয়। ইংরেজি এলার্জি (Allergy) শব্দটির অর্থ হলো ঃ "যা আসলেই নির্দোষ সে বিষয়ে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া"। তারা যদি গণতন্ত্র পরিভাষাটির বিকল্প কোন পরিভাষা তৈরি করে দুনিয়ায় চালু করার কোন ক্ষমতা রাখেন তাহলে চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু কোন বিকল্প পরিভাষা আবিষ্কার না করে গণতন্ত্রকে 'কুফরী মতবাদ' বলা মোটেই সংগত নয়। আজ পর্যন্ত তারা এর বিকল্প পরিভাষা দিতে পারেননি। এর বিকল্প হিসাবে 'বিপ্লব' পরিভাষা ব্যবহার করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মাদ্রাসা কমিটিতে কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে বিপ্লবী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?

মনগড়া ব্যাখ্যা

সবাই এ কথা স্বীকার করে যে, কোন কথার এমন ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। কোন লেখক বা বক্তার কোন কথার একাধিক ব্যাখ্যা হতে

পারে। তাই যার কথা তিনি যে ব্যাখ্যা দেন তা মেনে না নিয়ে উপায় নেই। মন্দ অর্থ গ্রহণ করা নৈতিক দিক দিয়ে সঠিক নয়।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে লেখা আছে, "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"। আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে কি তা লেখা হয়েছে? এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের ভোটের মাধ্যমেই হাসিল করতে হবে। সেনাবাহিনী বা কোন সশস্ত্র সন্ত্রাসী শক্তি অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল করলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ঐ কথাটি এমন ভাষায় হলে বেশি সঠিক হতো যার অন্য অর্থ করা যায় না। যেমন ঃ "শাসন ক্ষমতা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ থেকেই হাসিল করতে হবে"। অর্থাৎ ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সকল ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে তা জনগণের ভোটের মাধ্যমেই ফায়সালা করতে হবে।

জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টকে 'সার্বভৌম' বলা হয়। এখানেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করা উদ্দেশ্য নয়। এর অর্থ হলোঃ বাংলাদেশে আইন-রচনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে এ সংসদ দেশের বাইরে বা ভিতরের কোন শক্তির অধীন নয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে এ কথাও লেখা আছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি"। তাই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম বলা হয় না। এ পরিভাষাটির বিকল্প পরিভাষা তালাশ করা যেতে পারে। তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বুঝাবার জন্য এ পরিভাষাটির ওজন বিশ্বে স্বীকৃত।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই ইসলামী

নবী-রসূলগণই ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের আদর্শ। তাঁরা জনগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। যে কাওম দাওয়াত কবুল করেনি তাদের দেশে দ্বীন বিজয়ী হয়নি। কোন নবী সশস্ত্র আন্দোলন করে কোন দেশেই শক্তিবলে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেননি। নবীগণ মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন। মনের উপর শক্তি প্রয়োগ করা যায় না বলেই জোর করে জনগণকে হেদায়েত করা সম্ভব নয়। মক্কার জনগণ রসূল (সাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করতে রাযী হয়নি বলে সেখানে দ্বীন প্রথমে বিজয়ী হয়নি। মদীনার জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করায় রসূল (সাঃ) সেখানে ইসলামী সরকার কায়েম করতে সক্ষম হলেন।

জনগণ ইসলামী সমাজব্যবস্থা কবুল করতে রাযী না হলে আল্লাহ তায়ালা কোন অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠীর উপর দ্বীনের নেয়ামত জোর করে চাপিয়ে দেন না। জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার পরিবর্তন করার পদ্ধতিকেই গণতন্ত্র বলে। রসূল

(সাঃ) মদীনায় যে ইসলামী বিপ্লব সাধন করলেন তা গণতান্ত্রিক পন্থায়ই করেছেন। জোর করে তিনি মদীনাবাসীদের উপর ইসলামী শাসন চাপিয়ে দেননি।

যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে বিপ্লব করে ইসলামকে বিজয় করতে চান তারা বিপ্লব মানে যদি গণ-অভ্যুত্থান মনে করেন তাহলে এ বিপ্লবের সাথে গণতন্ত্রের বিরোধ নেই। বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই গণবিপ্লব ঘটানো সহজ। গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করা ছাড়া জনগণ গণ-বিপ্লবের জন্য উদ্বুদ্ধ হতে পারে না।

তথাকথিত বিপ্লবীরা ইরান বিপ্লবকে মডেল মনে করেন। ইরানে রাজতন্ত্র থাকায় ইমাম খোমেনী দীর্ঘ সময় গণ-সংগঠন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে হাজার হাজার মানুষ বুলেট বুকে নিয়ে শহীদ হতে এগিয়ে আসায় গণ-অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছে। যদি ইরানে গণতন্ত্র ও নির্বাচন পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তনের বিধান চালু থাকতো তাহলে এত হাজার হাজার মানুষকে ইসলামী বিপ্লবের জন্য শহীদ হতে হতো না।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল বলেই ১৯৯০ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রথা গণ-বিপ্লবের সহায়ক। যারা ইসলামী বিপ্লব চান, নির্বাচনকে ইসলাম বিরোধী মনে না করে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এগিয়ে আসতে পারেন।

আমরা নিশ্চিত যে তাদের নিকট তথাকথিত বিপ্লবের কোন সুস্পষ্ট রূপ রেখা নেই। তারা ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে তাদের সময়, মেধা, অর্থ ও শ্রমকে অন্ধকারে অপচয় করছেন। তারা নিজেরা তো বিভ্রান্ত আছেনই, তারা ইসলামী আন্দোলনের পেছনের কাতারের কিছু লোককে হয়তো বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হতেও পারেন। কিন্তু তারা মুসলিম সমাজের কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা ছাড়া ইতিবাচক কোন খেদমত করতে পারবেন না। গণতন্ত্র শব্দের বিশেষ এক অর্থকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে তারা বিপ্লবের অস্পষ্ট পথে হারিয়ে যাচ্ছেন।

ইসলাম ও গণতন্ত্র

অধ্যাপক গোলাম আযম